প্রথম অধ্যায়

রসায়নের ধারণা

(The Concepts of Chemistry)

তোমরা যারা নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছ। বইটি হাতে পেয়ে কিছু প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—রসায়ন বিষয়টি কী? কেনই-বা আমরা রসায়ন পড়ব? অর্থাৎ রসায়ন আমাদের কী কাজে লাগে? রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কি কোনো সম্পর্ক আছে? এসব বিষয়ের উত্তর এ অধ্যায়টি পড়লে জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা করতে পারব।
- রসায়নে ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব।
- প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

1.1 রসায়ন পরিচিতি (Introduction to Chemistry)

বিজ্ঞানের একটি শাখা হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science)। যুক্তি দিয়ে, পর্যবেক্ষণ করে অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাকৃতিক কোনো বিষয় সম্বন্ধে বোঝা বা তার ব্যাখ্যা দেওয়া বা সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করাই হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাজ। রসায়ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন: কয়লা একটি পদার্থ, কয়লার ভেতরে রয়েছে কার্বন। এখানে কয়লার ভেতরে কার্বন পরমাণুগুলো কীভাবে থাকে আবার কয়লা পোড়ালে কয়লা বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কীভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং তাপ উৎপন্ন করে এ ধরনের আলোচনাগুলো রসায়নে করা হয়। পদার্থ তা জীব হোক বা জড় হোক সবই রসায়নের আলোচনার বিষয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry), উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), মৃত্তিকাবিজ্ঞান (Soil Science) ইত্যাদি শাখা রয়েছে। তুমি যে খাবার খাচ্ছ তার মধ্যে কী কী পদার্থ আছে বা তা কীভাবে আছে (পদার্থের গঠন) সেটি রসায়নের বিষয়। আবার, তোমার অনেক সাধের সাইকেলটিও যেটা কেনার সময় অনেক সুন্দর ছিল, কিছু দিন পরে সাইকেলের যেসব অংশ লোহার তৈরি ছিল তার কোথাও কোথাও কেন মরিচা পড়ে গেছে এগুলোও রসায়নেরই বিষয়। এ বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকেই রসায়নের যাত্রা শুরু। তবে সম্ভবত প্রথম যেদিন দুটি পাথরকে ঘষে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল সেসময় থেকেই এই রসায়নের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে। এরপর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ধাতু নিষ্কাশন, মাটি পুড়িয়ে মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি, বিভিন্ন গাছের নির্যাস থেকে ওষুধ আর সুগন্ধিজাতীয় দ্রব্য তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে মানুষ রসায়নের ব্যবহার করে আসছে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হলো সোনা। এছাড়া সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তামা বা কপার, রুপা, টিন এসব ধাতু ব্যবহার করছে।

খ্রিস্টপূর্ব 3500 অব্দের দিকে কপার ও টিন ধাতুকে গলিয়ে তরলে পরিণত করে এবং এ দুটি তরলকে একত্র মিশিয়ে অতঃপর মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করে কঠিন সংকর ধাতুতে (alloy) পরিণত করা হয়। এ সংকর ধাতুর নাম ব্রোঞ্জ। এ ব্রোঞ্জ দিয়ে ভালো মানের অস্ত্র তৈরি করা হতো। তখনকার মানুষ পশু শিকার, ফসল ফলানো, জ্বালানি হিসেবে কাঠ সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় অনেক কাজে এ অস্ত্র ব্যবহার করত। এ ব্রোঞ্জ তখনকার মানবজাতির জন্য এক অতিপ্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হয়। ব্রোঞ্জ-এর আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা পদার্থের গঠন নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন। খ্রিস্টপূর্ব 380 অব্দের দিকে গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক পদার্থকে ভাঙতে থাকলে শেষ পর্যায়ে এমন

এক ক্ষুদ্র কণা পাওয়া যাবে যাকে আর ভাঙা যাবে না। তিনি এর নাম দেন অ্যাটম (Atom অর্থ indivisible বা অবিভাজ্য)। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় কোনো কোনো দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতো প্রায় একই ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণাগুলোর কোনো পরীক্ষামূলক ভিত্তি ছিল না। অ্যারিস্টটল এ ধারণার বিরোধিতা করেন। তখন অ্যারিস্টটলসহ অন্য দার্শনিকেরা মনে করতেন সকল পদার্থ মাটি, আগুন, পানি ও বাতাস মিলে তৈরি হয়। ফলে অ্যাটমের ধারণা অনেক দিন পর্যন্ত মানুষ গ্রহণ করেনি।

চিত্র 1.01: অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, রবার্ট বয়েল, স্যার ফ্রান্সিস বেকন এবং জন ডালটন।

মধ্যযুগে আরবের মুসলিম দার্শনিকগণ কপার, টিন, সিসা এসব স্বল্পমূল্যের ধাতু থেকে সোনা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের আরেকটি চেষ্টা ছিল এমন একটি মহৌষধ তৈরি করা, যা খেলে মানুষের আয়ু অনেক বেড়ে যাবে। তারা অবশ্য এগুলোতে সফল হননি। তবে তারা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। ফলে সোনা বানাতে না পারলেও বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে সোনার মতো দেখতে এমন অনেক পদার্থ তৈরি করেছিলেন এবং তাদের এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো লিখে রেখেছিলেন। মূলত এগুলোই ছিল রসায়নের ইতিহাসে প্রথম পদ্ধতিগতভাবে রসায়নের চর্চা বা রসায়নের গবেষণা। মধ্যযুগীয় আরবের রসায়ন চর্চাকে আলকেমি (Alchemy) বলা হতো আর গবেষকদের বলা হতো আলকেমিস্ট (Alchemist)। আলকেমি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ আল-কিমিয়া থেকে। আল-কিমিয়া শব্দটি আবার এসেছে কিমি (Chemi বা Kimi) শব্দ থেকে। এই Chemi শব্দ থেকেই Chemistry শব্দের উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হলো রসায়ন। আলকেমিস্ট জাবির-ইবনে-হাইয়ান সর্বপ্রথম গবেষণাগারে রসায়নের গবেষণা করেন। তাই তাঁকে কখনো কখনো রসায়নের জনক বলা হয়ে থাকে। জাবির-ইবনে-হাইয়ান বিশ্বাস করতেন সকল পদার্থ মাটি, পানি, আগুন আর বাতাস দিয়ে তৈরি। তাই তিনি গবেষণা করলেও রসায়নের প্রকৃত রহস্যগুলো তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। তবে রসায়নের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন করে রসায়ন চর্চা প্রথম শুরু করেন অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়ে, রবার্ট বয়েল, স্যার ফ্রান্সিস বেকন এবং জন ডাল্টনসহ অন্যান্য বিজ্ঞানী। অ্যান্টনি ল্যাভয়সিয়েকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়।

বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের গঠন, পদার্থের ধর্ম এবং পদার্থের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে রসায়ন বলে।

টেবিল 1.01: বিভিন্ন বিষয় রসায়নের দৃষ্টিকোণে বিশ্লেষণ

বিষয়/ঘটনা	রসায়নের দৃষ্টিকোণে ঘটনার বিশ্লেষণ
কাঁচা আম টক কিন্তু পাকা আম মিষ্টি।	কাঁচা আমে বিভিন্ন ধরনের জৈব এসিড থাকে যেমন: সাক্সিনিক এসিড, ম্যালেয়িক এসিড প্রভৃতি থাকে, ফলে কাঁচা আম টক। কিন্তু আম যখন পাকে তখন এই এসিডগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের সৃষ্টি হয়। তাই পাকা আম মিষ্টি।
কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও মোমের দহন।	কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মোম এগুলোর মূল উপাদান হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন আর হাইড্রোজেনের যৌগ। তাই যখন এগুলোর দহন ঘটে তখন বাতাসের অক্সিজেনের সাথে এগুলোর বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আলো আর তাপশক্তির সৃষ্টি হয়।
পেটের এসিডিটির জন্য এন্টাসিড ওষুধ খাওয়া।	পাকস্থলীতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড জমা হলে পেটে এসিডিটির সমস্যা হয়। এন্টাসিডে থাকে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। এ দুটি যৌগ এসিডকে প্রশমিত করে।

এ ঘটনাগুলো থেকে সহজেই বুঝতে পারছ যে, আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখার একটি হলো রসায়ন।

1.2 রসায়নের পরিধি বা ক্ষেত্রসমূহ (The Scopes of Chemistry)

যেখানে পদার্থ আছে সেখানেই রসায়ন আছে। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। বায়ুমণ্ডলে কিছু না কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন অনবরত ঘটছে। আমরা যে মাটির উপরে বসবাস করছি সে মাটিতেও প্রতি মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে অসংখ্য পরিবর্তন। শুধু বর্তমান সময় কেন, সুদূর অতীতেও এই পরিবর্তন ঘটেছে। যখন এ পৃথিবীর প্রথম জন্ম হলো তখন পৃথিবী এমন ছিল না, পৃথিবী ছিল খুবই উত্তপ্ত। সেখানে কোনো বাতাস ছিল না। ছিল না কোনো জীবের অস্তিত্ব। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটেছে অসংখ্য রাসায়নিক পরিবর্তন। সৃষ্টি হয়েছে বায়ুমণ্ডল, সৃষ্টি হয়েছে পানি, সৃষ্টি হয়েছে হাজারো রকমের

পদার্থ। এই সবকিছু মিলে পৃথিবীকে জীবজগতের জন্য বসবাস উপযোগী করেছে। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ তা ক্ষুদ্র অণুজীব (যেমন– ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা ইত্যাদি) হোক আর বৃহৎ উদ্ভিদ বা প্রাণীই হোক সকলের দেহই বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রতিটি দেহ হলো এক একটি বড় রাসায়নিক কারখানা। এখানে প্রতি মুহূর্তেই ঘটে চলেছে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া। আর সে জন্যই আমরা বেঁচে আছি। আবার, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে চলেছে আমাদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী। যেমন– তুমি যে জামাকাপড় পরছ, যে পেস্ট দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছ, যে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছ বা ত্বকে যে কসমেটিকস ব্যবহার করছ তা সবই রসায়নের অবদান। এছাড়া আমরা পরিষ্কারের কাজে সাবান, টয়লেট ক্লিনার, জীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার করছি বিভিন্ন ধরনের ওষুধসামগ্রী। আমাদের খাদ্য চাহিদাকে পূরণ করার জন্য ফসলের ক্ষেতে ব্যবহার করছি সার ও কীটনাশক। যানবাহনে ব্যবহার করছি পেট্রল, ডিজেল– এসবই শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি রসায়নের পরিধি এ ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা যাবে না। 1.02 টেবিলের সাহায্যে রসায়নের কিছু অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়া হলো–

টেবিল 1.02: রসায়নের কিছু ক্ষেত্র

বস্তু/পদার্থ	উপাদান	উৎস ও রাসায়নিক পরিবর্তন
বায়ু	প্রধানত অক্সিজেন	আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় যে বায়ু গ্রহণ করি সেই বায়ুর অক্সিজেন শরীরের ভেতরে খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে শক্তি উৎপাদন করে।
খাবারের পানি	পানিসহ বিভিন্ন খনিজ লবণ।	পানি আমাদের শরীরে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এটি শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের দ্রাবক হিসেবেও কাজ করে। জীবের শরীরের বেশির ভাগই পানি। শরীরের বিষাক্ত পদার্থ এ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে প্রস্রাব ও ঘামের সাহায্যে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। খাবারের পানিতে পানি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ যেমন– ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর লবণ থাকে, যা আমাদের শরীরের জন্য বিশেষ উপকারী।
সার	নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন, ফসফরাস,	উল্লিখিত মৌলগুলো উদ্ভিদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় উপাদান। বিভিন্ন সারে এসব মৌলের যৌগ থাকে। তাই বিভিন্ন ধরনের

	ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম	সার উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে। ফলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয়।
কাগজ	সেলুলোজ	কাগজের আবিষ্কার মানব সভ্যতার এক অনন্য অবদান। বাঁশ, আখের ছোবড়া ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে সেলুলোজ থাকে। কাগজ তৈরির কারখানায় এই সমস্ত বস্তুকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কাগজ তৈরি করা হয়।

1.3 রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক (Relationship Between Chemistry and Other Branches of Science)

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। যেমন– রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব ইত্যাদি। বিজ্ঞানের একটি শাখার সাথে অন্য একটি শাখার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন রসায়নের উপর নির্ভরশীল, রসায়নও তেমনি অন্যান্য শাখার উপর নির্ভরশীল। নিচে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে রসায়নের সম্পর্ক কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

জীববিজ্ঞানের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় তার সবুজ অংশে গ্লুকোজ তৈরি করে। সালোকসংশ্লেষণ মূলত একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং মূল দিয়ে পানি শোষণ করে। উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ অংশের ক্লোরোফিলের সাহায্যে এই পানি আর কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রাণী যে শর্করা বা প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় শরীর সেই খাবার ভেঙে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি উৎপন্ন করে। সমগ্র জীবদেহই রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের এ সকল রাসায়নিক পদার্থ ও তাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া জীববিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। তাই জীববিজ্ঞান ও রসায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পদার্থবিজ্ঞানের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: পদার্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে চুম্বক, বিদ্যুৎ, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। বিদ্যুতের জন্য যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তা রসায়নেরই অবদান। তেল, গ্যাস বা কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। রসায়নও আবার পদার্থবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। ভৌত রসায়ন হলো রসায়নের একটি শাখা যার বিভিন্ন তত্ত্ব মূলত পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং সূত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

গণিতের সাথে রসায়নের সম্পর্ক: রসায়নের সাথে গণিতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গণিতের সূত্র ব্যবহার করেই রসায়নের বিভিন্ন তত্ত্ব ও হিসাব-নিকাশ করা হয়।

এছাড়া বিজ্ঞানের আরও যে সমস্ত শাখা আছে তার প্রায় সব শাখার সাথেই রসায়নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

1.4 রসায়ন পাঠের গুরুত্ব (The Importance of Studying Chemistry)

ধরো, তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশে একটু পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজলে। তারপর বই নিয়ে পড়তে বসলে। পড়ার সময় মা তোমাকে চা আর বিস্কুট দিল। তুমি তা খেলে। খেয়ে গোসল করতে গেলে। গোসল করতে গিয়ে দেখলে তোমাদের বাথরুমটা একটু নোংরা হয়ে আছে। তাই তুমি টয়লেট ক্লিনার দিয়ে টয়লেট পরিষ্কার করলে। গোসল করার সময় ব্যবহার করলে সুগন্ধি সাবান আর শ্যাম্পু। গোসল শেষে গায়ে একটু লোশন মেখে নিলে। তারপর সকালের নাশতা সেরে স্কুলে গেলে। স্কুলে শিক্ষক চক দিয়ে বোর্ডে লিখে তোমাদের পড়া বুঝিয়ে দিলেন। লক্ষ কর, তুমি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করেছ যেমন– পেস্ট, ব্রাশ, বিস্কুট, টয়লেট ক্লিনার, সাবান, শ্যাম্পু, লোশন কিংবা চক সবই রসায়নের অবদান।

শুধু কি তাই? জমিকে উর্বর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে সার। ক্ষেতের ফসল যেন পোকা-মাকড়ে নষ্ট না করে তার জন্য মানুষ তৈরি করেছে কীটনাশক (insecticides)। খাদ্যকে দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করার জন্য তৈরি করেছে প্রিজারভেটিভস (preservatives) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। অর্থাৎ চাষাবাদ কিংবা খাদ্যের জন্য আমরা রসায়নের উপর নির্ভর করি।

আজ কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি যে সমস্ত রোগ মানুষের জন্য অতি সাধারণ চিকিৎসাযোগ্য রোগ, একসময় এ ধরনের রোগেই লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ এ সকল রোগের ওষুধ সফলতার সাথে আবিষ্কার করেছে। এখন ওষুধের আবিষ্কার এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি থেকেও মানুষ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা পেয়েছে।

শিল্পকারখানা, যানবাহন, মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী থেকে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক বর্জ্য আমাদের পরিবেশের ক্ষতিসাধন করছে। এর মাঝে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, বিভিন্ন এসিড, বিভিন্ন ভারী ধাতু (যেমন– পারদ, লেড, আর্সেনিক, কোবাল্ট ইত্যাদি) সহ আরও অনেক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য। এগুলো বায়ুর সাথে মিশে বায়ুদূষণ, পানির সাথে মিশে পানিদূষণ এবং অন্যান্য উপায়ে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করেই চলেছে। এগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ বা মাছের শরীরে প্রবেশ করে তাদের ক্ষতিসাধন করছে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ। যেমন– ফসলের ক্ষেতে ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ধ্বংস করার কাজে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ঐ অতিরিক্ত কীটনাশক

বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিলের পানিতে গিয়ে পড়ে যা ঐ পানিকে দূষিত করে। আবার, বাতাসের সাথে মিশে বাতাসকে দূষিত করে অর্থাৎ কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। রসায়ন পাঠ করলে এ রকম প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

তাহলে বুঝতে পারলে রসায়ন একদিকে যেমন অনেক প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করছে, তেমনই তার অযৌক্তিক এবং অবিবেচকের মতো ব্যবহার পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। এখনো অনেক রোগের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। আরও রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সেসব ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা এখন আমাদের দায়িত্ব। কাজেই তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ রসায়ন পাঠ করে একদিকে আমরা যেরকম মানবকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন জিনিস তৈরি করতে পারব, একই সাথে পরিবেশের জন্য কোনটি ক্ষতিকর সেটি বুঝতে পারব। আর তোমরা রসায়ন অধ্যয়ন করে এ পৃথিবীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা তোমাদের কাছে সবার প্রত্যাশা।

1.5 রসায়নে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়া (The Process of Research in Chemistry)

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানবজাতির কল্যাণসাধন করা। এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানী নাম শুনতেই তোমাদের নিশ্চয়ই আইনস্টাইন, নিউটন, আর্কিমিডিস, ল্যাভয়সিয়ে, গ্যালিলিও এরকম মহান মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, তাঁরা তো অবশ্যই মহান বিজ্ঞানী। তবে বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তাতে তোমরাও হতে পারো এক একজন বিজ্ঞানী। আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জন হয় সেই জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে গবেষণা। যিনি এই গবেষণা করেন তিনিই বিজ্ঞানী।

কাজেই তুমিও যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করো তাহলে তুমিও হতে পারবে একজন বিজ্ঞানী। সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার নামই গবেষণা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ গবেষণার জন্য কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। রসায়ন গবেষণারও পদ্ধতি রয়েছে। এখন রসায়ন গবেষণার পদ্ধতি তোমাদের কাছে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হবে।

গবেষণার জন্য প্রথমেই তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে যে তুমি কী জানতে চাও বা কোন ধরনের নতুন পদার্থ তুমি আবিষ্কার করতে চাও। ধরা যাক, তুমি জানতে চাও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ উৎপাদিত হবে না শোষিত হবে? একে বলে বিষয় নির্বাচন।

তাহলে তোমাকে সবার আগে এই বিষয়ে কিছু বইপত্র পড়তে হবে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো পরীক্ষা আগে করা হয়েছে এমন ধরনের গবেষণাপত্র ইন্টারনেট থেকে বা অন্য কোনোভাবে সংগ্রহ করে তা থেকে তোমার ফলাফল সম্পর্কে আগেই একটি অনুমান করে নিতে হবে। ধরো, তুমি কোনো বই বা গবেষণাপত্র থেকে জানতে পেলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হলে তাপ সৃষ্টি হয়। তুমি এই গবেষণাপত্র থেকে আরো জানতে পারবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত করার জন্য কোন কোন যন্ত্রপাতি, কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ এবং কোন প্রণালি ব্যবহার করা হয়েছিল। এ থেকে তোমার পরীক্ষাটি (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করা) করার জন্য কী কী পাত্র, যন্ত্রপাতি বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে এবং কোন প্রণালি অনুসরণ করতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা পাবে। তুমি হয়তো মনে করলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ তুমি ফলাফল সম্পর্কে অনুমান করতে পারলে।

আবার, প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কোন প্রণালিতে তুমি পরীক্ষাটি করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তুমি ধারণা পেয়েছ যে এ পরীক্ষাটি করতে বিকার, পানি, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, থার্মোমিটার, কাচের তৈরি রড, ব্যালেন্স (নিক্তি) ইত্যাদি জিনিস লাগবে। প্রথমে বিকারে পানি নিতে হবে। তারপর থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা নিতে হবে। তারপর কয়েকবার করে ওজন করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিকারের পানিতে যোগ করতে হবে এবং কাচের রড দিয়ে সেটুকুকে দ্রবীভূত করতে হবে। প্রতিবার থার্মোমিটারের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। এটি হলো প্রণালি যার সাহায্যে তুমি পরীক্ষাটি করবে। এবার শুরু হবে তোমার পরীক্ষণ।

টেবিল 1.03: অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূতকরণ

বিকারে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ	দ্রবণের তাপমাত্রা
0 গ্রাম (দ্রবীভূত করা হয়নি)	25°C
5 গ্রাম	20°C
10 গ্রাম	15°C
15 গ্রাম	10°C

তুমি বিকারে 250 মিলি পানি নিয়ে এর তাপমাত্রা থার্মোমিটারে দেখে নাও। ধরো, এখন তাপমাত্রা 25°C। তুমি এটি তোমার খাতায় লিখে রাখো। এবার ব্যালেন্সের সাহায্যে 5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মেপে নিয়ে বিকারের পানিতে দাও। কাচদণ্ড দিয়ে নেড়ে নেড়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটুকু দ্রবীভূত করো। দ্রবীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে থার্মোমিটার দিয়ে আবার তাপমাত্রা মাপ। ধরো, এবার তাপমাত্রা 20°C হলো। ব্যালেন্সের সাহায্যে আবার 5 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বিকারের দ্রবণে একইভাবে দ্রবীভূত করো। এতে বিকারের দ্রবণে মোট অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হলো 10 গ্রাম। এই রকম পরীক্ষা আরও একবার করো। তৃতীয়বারে বিকারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ হলো 15 গ্রাম এবং ধরা যাক

দ্রবণের তাপমাত্রা হলো 10°C। প্রতিটি ধাপে প্রাপ্ত তথ্য (Data) খাতায় লিখে রাখো। এবার তোমাকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সাজাতে হবে এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে। তথ্যগুলো কেমন হতে পারে সেটি 1.03 টেবিলে দেখানো হয়েছে।

পাশের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবে দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যত বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হচ্ছে দ্রবণের তাপমাত্রা তত কমে যাচ্ছে। এ থেকে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যেহেতু পানিতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত করলে দ্রবণের তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে, তাই এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানি থেকে তাপ শোষণ করে দ্রবীভূত হচ্ছে। অর্থাৎ ফলাফল (Result) এই যে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ শোষিত হয়। উপরের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে তুমি যে সকল ধাপ অনুসরণ করলে সেগুলোকে ফ্লো চার্ট (Flow Chart) বা প্রবাহমান তালিকার মাধ্যমে নিম্নরূপে দেখানো যায়।

বিষয়বস্তু নির্ধারণ
বই বা পূর্বের গবেষণাপত্রের সাহায্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু ধারণা নেওয়া
প্রয়োজনীয় বস্তু ও পরীক্ষা প্রণালি নির্ধারণ
পরীক্ষণ
তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের বিশ্লেষণ
ফলাফল ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা

চিত্র 1.02: রসায়নে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ

রসায়নের যেকোনো পরীক্ষা বা গবেষণার জন্য সব সময় উপরের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

1.6 রসায়ন পরীক্ষাগার ব্যবহারে ও পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা গ্রহণ (Safety Measures in Chemistry Laboratory and in Use of Chemicals)

যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা করা হয় তাকে পরীক্ষাগার বা গবেষণাগার (Laboratory) বলে। তাই যেখানে রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা গবেষণা করা হয় তাকে রসায়ন পরীক্ষাগার বা রসায়ন গবেষণাগার (Chemistry Laboratory) বলে। বুঝতেই পারছ রসায়ন গবেষণাগারে থাকবে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। প্রায় প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্যই আমাদের জন্য অথবা পরিবেশের জন্য কম-বেশি ক্ষতিকর। কোনো রাসায়নিক দ্রব্য বিস্ফোরক জাতীয়, কোনো রাসায়নিক

দ্রব্য দাহ্য (সহজেই যাতে আগুন ধরে যায়), কোনোটি আমাদের শরীরের সরাসরি ক্ষতি করে আবার কোনোটি পরিবেশের ক্ষতি করে। রসায়ন পরীক্ষাগারে যে যন্ত্রপাতি বা পাত্র ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই কাচের তৈরি। তাই এ রসায়ন পরীক্ষাগারে ঢোকা থেকে শুরু করে বের হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অসতর্ক হলেই যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেমন– এসিড গায়ে পড়লে তোমার শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হবে। পোশাকে পড়লে তোমার পোশাকটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রসায়ন গবেষণাগারে অগ্নিকাণ্ড বিস্ফোরণসহ নানা ধরনের ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই শরীরকে রক্ষা করতে তোমাকে পরতে হবে নিরাপদ পোশাক বা অ্যাপ্রোন (apron)। রসায়ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত অ্যাপ্রোনের হাতা হবে হাতের কবজি পর্যন্ত আর লম্বায় তোমার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। এটি হয় সাদা রঙের। হাতকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ববহৃত হয় হ্যান্ড গ্লাভস। চোখকে রক্ষা করার জন্য সেফটি গগলস ব্যবহার করা হয়।

নিচের ছবিতে এরকম কয়েকটি জিনিসের ছবি দেওয়া হলো।

চিত্র 1.03: অ্যাপ্রোন, সেফটি গগলস, হ্যান্ড গ্লাভস এবং মাস্ক।

যেকোনো রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের আগেই আমাদের জেনে নিতে হবে সে রাসায়নিক দ্রব্যটি কোন প্রকৃতির। সেটি কি বিস্ফোরক অথবা দাহ্য নাকি তেজস্ক্রিয়? সেটি বোঝানোর জন্য রাসায়নিক পদার্থের বোতল বা কৌটার লেবেলে এক ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি সর্বজনীন নিয়ম (Globally Harmonized System) চালুর বিষয়কে সামনে রেখে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন পদার্থের ঝুঁকি এবং ঝুঁকির মাত্রা বোঝানোর জন্য সর্বজনীন সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করা হয়।

নিচের টেবিলে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন এবং সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের যে সকল ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা বোঝানো হয় তা দেওয়া হলো।

টেবিল 1.04: সাংকেতিক চিহ্ন ও সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের ঝুঁকি

সাংকেতিক চিহ্ন	সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থের ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
 বিস্ফোরক পদার্থ (Explosive substance)	এ চিহ্নবিশিষ্ট পদার্থ থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে এসব পদার্থে আঘাত লাগলে বা আগুন লাগলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হতে পারে, যার জন্য শরীরের এবং গবেষণাগারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই এ দ্রব্যগুলো খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। টিএনটি, জৈব পার-অক্সাইড, নাইট্রোগ্লিসারিন ইত্যাদি এ ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ।
 দাহ্য পদার্থ (Flammable substance)	অ্যালকোহল, ইথার ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ। এসব পদার্থে দ্রুত আগুন ধরে যেতে পারে। তাই এদের আগুন বা তাপ থেকে সব সময় দূরে রাখতে হবে।
 বিষাক্ত পদার্থ (Toxic substance)	এ চিহ্নধারী পদার্থ বিষাক্ত প্রকৃতির। তাই শরীরে লাগলে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের নানা ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বেনজিন, ক্লোরোবেনজিন, মিথানল এ ধরনের পদার্থ। এ ধরনের পদার্থ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
 উত্তেজক পদার্থ (Irritant substance)	সিমেন্ট ডাস্ট, লঘু এসিড, ক্ষার, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ ত্বক, চোখ, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতি করে। তাই এ ধরনের পদার্থ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস এগুলো ব্যবহার করতে হবে।
 স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ (Health risk substance)	এ ধরনের পদার্থ ত্বকে লাগলে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীরের ভেতরে গেলে শরীরের স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিসাধন করে। এগুলো শরীরের মধ্যে গেলে ক্যানসারের মতো কঠিন রোগ হতে পারে কিংবা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে। এ ধরনের পদার্থের উদাহরণ হলো বেনজিন, টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি। তাই এগুলোকে সতর্কভাবে

	রাখতে হবে এবং ব্যবহারের সময় অ্যাপ্রোন, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গগলস এগুলো পরে নিতে হবে।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radioactive substance)	এসব পদার্থ থেকে ক্ষতিকারক রশ্মি বের হয় যা ক্যানসারের মতো মরণব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে কিংবা একজনকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে। তাই এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যেমন– ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর (Dangerous for environment)	এ চিহ্নধারী পদার্থগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক। এ ধরনের পদার্থের উদাহরণ হলো লেড, মার্কারি ইত্যাদি। তাই এগুলোকে ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আবার, ব্যবহারের পরে যেখানে-সেখানে না ফেলে তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। এসব পদার্থকে যথাসম্ভব পুনরুদ্ধার করে আবার ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এগুলো সহজে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারবে না।
ক্ষত সৃষ্টিকারী (Corrosive)	এ চিহ্নধারী পদার্থ শরীরে লাগলে শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে তা শরীরের ভেতরের অঙ্গেরও ক্ষতিসাধন করতে পারে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ঘন দ্রবণ এ জাতীয় পদার্থের উদাহরণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে নিচের কোন পদার্থটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) প্রিজারভেটিভস (খ) কীটনাশক

(গ) ওষুধ (ঘ) সার

2. নিচের সাংকেতিক চিহ্নটি কী প্রকাশ করে?

(ক) বিস্ফোরক পদার্থ (খ) দাহ্য পদার্থ
(গ) তেজস্ক্রিয় রশ্মি (ঘ) আগুনের শিখা

3. নিচের কোন চিহ্নটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্দেশ করে?

(ক) (খ)

(গ) (ঘ)

4. কপারের সাথে অন্য কোন ধাতুকে গলিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়?

(ক) লোহা (খ) জিংক
(গ) টিন (ঘ) লেড

সৃজনশীল প্রশ্ন

1.

A

B

চিত্র A: ওষুধ সেবনের ছবি চিত্র B: সবজিক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর ছবি

(ক) গবেষণা কী?
(খ) পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কেন?
(গ) উদ্দীপকের A নং চিত্রে রসায়ন কীভাবে সম্পর্কিত–ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) উদ্দীপকের কোনটির অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর– যুক্তিসহ লিখ।

2.

চিত্র-1

চিত্র-2

চিত্র-3

(ক) রসায়ন কী?

(খ) পেটে এসিডিটির জন্য এন্টাসিড খাওয়া হয় কেন?

(গ) চিত্র-3 এর সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ মানুষের কী ক্ষতিসাধন করে- ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) চিত্র-1 ও চিত্র-2 এর সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থসমূহের ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ– ব্যাখ্যা করো।